মানবতাবাদ : প্রত্যক্ষ জীবনদর্শন

রেবেকা সুলতানা*

Abstract: This world is plagued with multiplicity of problem. There are dashes among the people, malice and warth, fray and fiction among the nations, war among the countries, premature death and competation in producing weapons in every corner of the world which spoil the world peach. As consequences, humanity is humiliated and overlooked. Although science and technology has made our life easier, it has not ensured peace yet. In this hard time we are living in, it has become necessary to practice the eternal enunciation of humanity and non-violence.The present eassy has focused on social and philosophical analysis and spread of humanism trend such as philosophy of life. Humanistic tend to advocate for human rights, free speech, progressive policies and democracy.

মৌলিক শব্দ : মানবতাবাদ, জীবনদর্শন, পাশ্চাত্য দর্শন, প্রাচ্যদর্শন, সাম্যবাদ, ধর্মীয় বিশ্বাস।

মানবতাবাদ হলো এমন এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি যা মানবজীবনের যাবতীয় বিষয়ের বিবেচনায় মানুষই কেন্দ্রবিন্দু। এটি হলো প্রত্যক্ষ জীবনদর্শন। মানুষের মঙ্গল ও অগ্রগতির ধারণাকে বেগবান করার ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে মানবতাবাদ। কাজেই পণ্ডিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে এ শব্দটি বেশ পরিচিত। মানবতাবাদের ইতিহাস পুরোনো হলেও সময়ের পরিবর্তনের সাথে মানবতাবাদের ধারণার পরিবর্তন স্বাভাবিক ঘটনা। পাশ্চাত্য দর্শনে সোফিস্টদেরকে মানবতাবাদের প্রথম প্রচারক হিসাবে মনে করা হয়। মানবতাবাদের মৌল ও মুখ্য উপাদান হলো মানুষের একত্ব, অখণ্ডত্ব ও সাম্যের ধারণা। মানবাতবাদের মূল কথার প্রকাশ দেখা যায় কবি নজরুলের 'মানুষ' কবিতায় । এখানে কবি বলেন:

> গাহি সাম্যের গান-
> মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্
> নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
> সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

মানবতাবাদ বিজ্ঞান, বুদ্ধি এবং গণতন্ত্রের মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সমস্যার সমাধান করে থাকে। মানবতাবাদ ঈশ্বর বা ঈশ্বরের ভাষা বর্জন করে চলে। অতিপ্রাকৃত বক্তব্য এ মতবাদে পরিলক্ষিত হয় না বললেই চলে। মানবতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনাচরণে সৎকর্মই হলো প্রার্থনা। সারা বিশ্বই প্রার্থনার স্থান। মূলকথা হলো, সৃষ্টিকে ভালোবাসাই প্রার্থনা। এরূপ ভালোবাসাকে মানবতাবাদ বলা যেতে পারে। আর মানবতাবাদী হলেন তিনি, যিনি মানুষের কল্যাণে সবকিছু ব্যয় করতে পারেন। তাঁরা মনে করেন মানুষ কোনো ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়। প্রকৃতিতেই মানুষের জন্ম। মানুষের জীবনসঙ্গি হচ্ছে এ প্রকৃতি। পরিবেশের সাথে খাপ খেয়ে

* অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চলাই হলো মানুষের লক্ষ্য। মানুষকে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারাই বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হবে। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দক্ষতার মধ্য দিয়েই মানুষ জীবনকে উন্নত ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে। কারণ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের বিচার প্রক্রিয়া মানুষের উপর নির্ভর করে, ঈশ্বরের উপরে নয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রবাদীরা দাবি করেন যে, কমিউনিজম বা সাম্যবাদ মানবতাবাদের সর্বোত্তম ভাস্বর, কারণ এটি প্রাচীন ও মধ্যযুগের অসাম্যের সর্ববিধ নির্দশন নির্মূল করে দেয় ও ন্যায়-নীতির প্রতিষ্ঠা করে এবং এ নীতি ঘোষণা করে, যার যা সামর্থ্য তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা আর একান্ত প্রয়োজন অনুসারে তাদেরকে তা দেয়া। মানবতাবাদ পৃথিবীর সমস্ত লোকের জন্য শান্তি, শ্রম, স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী ও সুখের অধিকার ঘোষণা করে। মানবতাবাদ হলো মানুষের দ্বারা রচিত প্রত্যক্ষ জীবনদর্শন।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে মানবতাবাদ এক বিশিষ্ট স্থান অর্জন করে আছে। প্রাচীনকাল থেকে সাম্প্রতিকাল পর্যন্ত বিভিন্নভাবে মানবতাবাদী ধারণা বিকাশ লাভ করেছে। প্রাচীনকালে সক্রেটিস যেমন মানবকল্যাণে নিজের জীবন দিয়েছিলেন তেমনি সাম্প্রতিককালে আমরা জ্যা-পল-সার্ত্রের দর্শনে অস্তিত্ববাদী মানবতাবাদী ধারণা লক্ষ্য করি। কাজেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে মানবতাবাদ প্রত্যক্ষ জীবনদর্শন হয়ে উঠেছে তা তুলে ধরাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পৃথিবী সব সময় মানুষের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। সেক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে এগিয়ে নিতে অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়েছে। সেক্ষেত্রে মানবতাবাদী দর্শন মানুষকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কেননা এ মতবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ। মানুষ কীভাবে পার্থিব জীবনকে সুন্দর ও মূল্যবান করতে পারে তা আলোচিত হয়েছে। মানবতাবাদী পরিবেশে মানুষ যেকোনো সংকট মোকাবেলা করে মুক্তবুদ্ধি, উদারতা, সৃজনশীলতা ইত্যাদি চর্চা করতে পারে। ফলে মানুষের মনুষ্যত্ব, মমত্ববোধ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়। কাজেই যেকোনো সংকটে এই প্রত্যক্ষবাদী জীবনদর্শন মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। তাই প্রাচীনকাল থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত কোনো সময়ই এ দর্শন গুরুত্ব হারায়নি। বরং মানুষের সর্বোচ্চ বিকাশের জন্য এ দর্শনের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রত্যক্ষ জীবন দর্শনে মানবতাবাদ কীভাবে কাজ করছে এবং সমাজকে প্রভাবিত করছে তার স্বরূপ উন্মোচনের লক্ষ্যে আলোচ্য গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হবে।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে সামাজিক গবেষণাপদ্ধতির গুণগত (qualitative) পদ্ধতি প্রয়োগ করে মানবতাবাদ বিষয়ে পর্যালোচনা করে মানবতাবাদী ধারণা কিভাবে প্রত্যক্ষ জীবনদর্শনে প্রভাব রাখছে তা তুলে ধরার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে দর্শন গবেষণার বিশ্লেষণী পদ্ধতি গ্রহণ করে মানবতাবাদ বিষয়ক ধারণাগুলোকে মূল্যায়নের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী গবেষণা নির্ভর হওয়ায় প্রবন্ধটি রচনায় সমকালীন ও পূর্ববর্তী রচনাবলি বিশ্লেষণ করে তুলনামূলক আলোচনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থমূল্যায়ন

সভ্যতার শুরুতেই মানবতাবাদ পরিলক্ষিত হয়। যিশু খ্রিষ্টের জন্মের ৪৫০ বছর আগেই প্রোটাগোরাসের (৪৮০-৪১০ খ্রি.পূ.) চিন্তায় এই মানবতাবাদী ধারণা পাওয়া যায়। তিনি প্রথম বলেন 'Man is the measure of all things'। তিনি তাঁর *On the Gods* গ্রন্থে প্রচলিত মতবাদ বিরোধী কথা

বলেছেন। মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু প্রচলিত মতবাদের চাপে মানবতাবাদী ধারণা সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠ করা সম্ভব হয়নি। তিনি ঈশ্বর ও দেবতার ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন না।

সক্রেটিসও জ্ঞান ও মানবতাবাদের প্রচার করেছেন। কিন্তু তিনি এ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি বরং মানবিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক মত প্রচারের জন্য তাঁকে হত্যা করা হয়।

চীনের দার্শনিক কনফুসিয়াস মানবতাবাদের ব্যাখ্যায় সুনীতি ও সুআচরণের কথা বলেন। তিনি মানবতাবাদের কথা বলতে গিয়ে *Analects* গ্রন্থে বলেন যে, ঈশ্বরের ধারণা মানসিক ও নৈতিক বোধের পক্ষে ক্ষতিকর। তিনি চেয়েছেন মানুষ জীবনকে ভালোবাসুক, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক প্রভুদের দাপটে তিনি এ ধারণাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। কনফুসিয়াস চেয়েছিলেন চীনারা জীবনকে ভালোবাসুক।

জেরেমি বেনথাম, জেমস মিল ও জন স্টুয়ার্ট মিলের উপযোগবাদী আলোচনায় আমরা অধিকাংশ মানুষের কল্যাণের মধ্যে মানবতাবাদী আলোচনা লক্ষ করি। প্রয়োগবাদী দার্শনিক এফ.সি.এস শিলার তাঁর *Studies in Humanism* গ্রন্থে গ্রিক দার্শনিক প্রোটাগোরাসের মতো বলেন, 'Man is the measure of reality' এখানে তিনি স্বার্থপর মানুষকে নির্দেশ না করে, বিশ্বপ্রেমিক, প্রজ্ঞাশীল, বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কথা বলেছেন। তাঁর মতবাদকে সর্বাত্মকবাদও বলা যায়। কেননা তিনি বলেন, সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতাই মানুষের মূল্যায়নের ওপর নির্ভর করে।

বার্ট্রান্ড রাসেলের চিন্তায়ও মানবতাবাদের প্রসার লক্ষ করা যায়। তিনি ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত 'British Rationlists Association'-এর সভাপতি এবং ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'British Humanist Association'-এর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

সাম্প্রতিককালে আমরা অস্তিত্ববাদী মানবতাবাদের আলোচনা দেখি জ্যা-পল-সার্ত্রের দর্শনে। তিনি তাঁর যেমন মানুষের স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়ে সব সময় সম্ভাবনাময়ী হিসেবে তুলে ধরেছেন। আবার তিনি তাঁর *Existentialism and Humanism* গ্রন্থে অস্তিত্ববাদকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন অস্তিত্ববাদ এমন এক মতবাদ যা মানবজীবনের অগ্রযাত্রাকে সম্ভব করে তোলে। তিনি মনে করেন মানুষ যেমন নিজের জন্য দায়ী, তেমনি জাতির জন্যও দায়ী। প্রত্যেকে নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মধ্য আসলে সমগ্র মানব জাতির জন্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এভাবে অস্তিত্ববাদী দর্শন আত্মকেন্দ্রিক দর্শন থেকে বেরিয়ে মানবতাবাদী দর্শনে রূপ নেয়। এভাবে মানবতাবাদ যুগে যুগে বিভিন্নরূপে বিকাশ লাভ করেছে।

বসুধা চক্রবর্তী তাঁর *মানবতাবাদ* গ্রন্থে গ্রিক চিন্তায়, প্রাচ্যে, ধর্মে, রেনেসাঁয়, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ও মার্কসবাদে কিভাবে মানবতাবাদ আলোচিত হয়েছে এবং মানবতাবাদের পথ ও পথের শেষ কোথায় তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন সমাজ, ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র এবং ব্যক্তি মানুষ মানবতাবাদী সত্তাতে উত্তীর্ণ হতে পারলেই সর্বাধিক কল্যাণকর সমাজ গঠন করতে পারবে।

আলোচ্য প্রবন্ধে মানবতাবাদকে গতানুগতিক নিরীশ্বরবাদী এবং আধ্যাত্মিক ধারণা থেকে বের করে এনে একটি গণতান্ত্রিক, নৈতিক, যৌক্তিক ও প্রত্যক্ষ জীবনদর্শন হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে মানুষের দায়িত্ব ও অধিকার হলো নিজ জীবনকে অর্থপূর্ণ ও গতিময় করে তোলার সাথে সাথে যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তা প্রয়োগ করে একটি অধিকতর মানবীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

মানবতাবাদ

মানবতাবাদে চিন্তার সাথে কাজকেও বিশ্বাস করা হয়। মানবতাবাদ কেবল চিন্তাবিদ সৃষ্টি করে না কর্মীও সৃষ্টি করে। মানবতাবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, হাজী মুহাম্মদ মহসীন, রাজা রামমোহন

রায়, পেত্তালেজি, ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার, কামাল আতার্তুক, কার্ল মার্কস, বার্ট্রান্ড রাসেল, মাদার তেরেসা, অগাস্টে কোঁতে, জ্যাঁ-পল সার্ত্র প্রমুখ। কাজ ও মতের ভিত্তিতে মানবতাবাদের বিভিন্ন ভাগ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ধর্মীয় মানবতাবাদ, ইহজাগতিক মানবতাবাদ, অজ্ঞেয়বাদী মানবতাবাদ, মার্কসবাদী মানবতাবাদ, অস্তিত্ববাদী মানবতাবাদ ইত্যাদি। মানবতাবাদকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হলেও প্রতিটি মানবতাবাদী ধারণার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, সামান্য কিছু বিষয় ব্যতীত মানবতাবাদী সকল ধারণাই একই অর্থ বহন করে। আর এ অর্থটি হলো মানবকল্যাণ। কেননা মানবতাবাদের মূলকথা হলো সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করা। সুতরাং বলা যায় যে, প্রগতিবাদের উৎপত্তিই হলো মানবতাবাদের ধারণা থেকে।

মানবতাবাদে মানুষের মর্যাদার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। মানুষ যে পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনসত্তা এবং মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তার কর্মদক্ষতা। এটাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায় মানবতাবাদী মতবাদে। কারণ, এ মতবাদে মনে করা হয় যে, মানবতাবাদী পরিবেশে মানুষের মুক্তবুদ্ধি ও সৃজনশীলতার বিকাশ সুষ্ঠুভাবে ঘটে। মুক্তবুদ্ধির প্রধান লক্ষণ হলো মনুষ্যত্ব, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। "কাজেই মানবতাবাদ বলতে এমন একটা দার্শনিক মতবাদ বুঝায় যা মানুষের সৃষ্টিধর্মী ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করে।" (শরীফ হারুন, ১৯৯৯ : ১৮) চর্যাপদ নাথসাহিত্য, মঙ্গল কাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, সুফিসাহিত্য, শাক্তপদ, বাউলগান ইত্যাদি রচনা এক এক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রেরণা ও অনুভূতি থেকে উৎসারিত হয়েছে। তবুও একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ সকল রচনায় কোনো না কোনো ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক চেতনামুক্ত উদার মানবতাবাদের ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। তবে পদকর্তারা ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধমতের সমর্থক। তাঁদেরকে উদারপন্থি মানবতাবাদীও বলা যেতে পারে। কেননা তাঁরা কখনও জাত-পাতের বিচার করেননি। চর্যাপদকর্তা সরহপা বলেন, মুক্ত মনের অধিকারী না হলে এরূপ ধারালো যুক্তি ও উদার মানবতার কথা কেউ বলতে পারেন না । তিনি 'দোহা গানে' বেদাচারের বিরোধিতা করেন । তাঁর ভাষায়,

কিং তো দীবেঁ কিং তো নিবিজ্জেঁ
কিং তো কিন্তই মন্তহ সেব্বেঁ।
কিং তো তিথ তপোবন জাই
মোক্খ কি লবভই পানী হ্নাই। (সুকুমার সেন: ১৯৬৬)

অর্থাৎ কী হবে তোর দীপে, কী হবে তোর নৈবেদ্যে? কী হবে তোর মন্ত্রে ও সেবায়? তীর্থে তপোবনে গিয়েই বা তোর কি হবে? মোক্ষ কি লাভ হয় জলে স্নান করে?

সুতরাং বলা যায় যে, মানবতাবাদ কেবল মানুষের মহিমা ব্যক্ত করে না, বরং একই সঙ্গে এখানে মানব কল্যাণের আদর্শের কথাও প্রচার করে। মানবতাবাদী হওয়া মানে হলো মহৎ কর্মের উজ্জ্বল দীপ্তিতে জীবন ও সমাজকে পূর্ণ করে তোলা, জ্ঞানার্জনের আকাঙ্খাকে প্রজ্জ্বলিত রাখা, যুক্তির মূল্য দেওয়া, কুসংস্কারকে পরিহার করা, নিরাশা দূর করা, আশাকে বরণ ও পালন করা এবং সর্বোত্তম কাজ করতে চেষ্টা করা। মানবতাবাদে মানবপ্রেমকে সবার ওপরে স্থান দেয়া হয়। কারণ মানবপ্রেমই জীবনাচরণে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদরেখা মুছে দিতে পারে। ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হলে মানবতাবাদের কোন বিকল্প নেই। কেননা ধর্মীয় কুসংস্কার মনুষ্যত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। আর মনুষ্যত্বের সঠিক বিকাশ সাধন না হলে আমাদের জীবন আলোকিত হবে না। ঘুণে ধরা এ বিশ্বকে বদলানোর জন্য দরকার মানবতাবাদের জয় জয়াকার ।

দেশ ও সমাজের কল্যাণের জন্য শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। মানবতাবাদ চায় রাজনীতি, ধর্ম ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে বুঝে প্রগতির পথে অগ্রগতির একটা মানসিক শক্তি প্রস্তুত করতে যার মাধ্যমে সফলতা একদিন আসবেই। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে অন্ধত্বকে দূর করতে হবে। বিবেককে জাগ্রত রেখে নৈতিক শক্তির উন্নয়ন করতে হবে। তবেই মানুষ একদিন পৃথিবীকে জয় করতে পারবে। মানবকল্যাণ প্রেরণার উৎস হচ্ছে মানবতা নিষ্ঠা। জীবনকে কাজে লাগিয়ে মানুষের কল্যাণের উপর জোর দেয়া হয়েছে মানবতাবাদে। মানব জীবনের জন্ম হয় বৃহত্তর সমাজ ও মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে। এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে জাগতিক কল্যাণের লক্ষ্যে মানুষের জন্ম। আত্মমানবতার সেবায় জীবন উৎসর্গ করাই হলো মানুষের মূল লক্ষ্য। মানুষের মূল্যবোধ ও স্বাধীনতার মর্মকথা জাগতিক কল্যাণ কর্মের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এখানে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই।

মানবতাবাদের উৎস

মানব সম্পর্কে আলোচনা হলো মানবতাবাদ। মানবতাবাদ হলো এমন এক জীবন দর্শন, যা মানুষের মান-মর্যাদা, সম্মানবোধ, দয়া-মায়াবোধ, ব্যক্তিত্ববোধ ও মূল্যবোধকে স্বীকার করে নেয়। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের যে দর্শন তা হলো মানবতাবাদী দর্শন। এ প্রসঙ্গে আবুল কাশেম ফজলুল হক বলেন,

যে দর্শন মানুষের মর্যাদার প্রতি আস্থাশীল, মানুষের সুখ-শান্তি ও সার্বিক উন্নতির প্রচারক তা হলো মানবতাবাদী দর্শন। মানবতাবাদ জীবনেরই নামান্তর। (আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৯৮৪):

আধুনিক অর্থে মানবতাবাদ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইতালিতে শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রসার লাভ করে। মানবতাবাদের উৎস মানব সভ্যতার উষালগ্নে পরিলক্ষিত হয় স্পষ্টভাবে কিংবা অস্পষ্টভাবে। কেননা, মানবতাবাদ শব্দটি দ্বারা মানুষের প্রতি দয়া বা প্রীতির ভাবকেই বোঝানো হয়।

সাধারণত মানবতাবাদ বলতে বুঝায় মানব-মানবতা, মানুষ মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং মানবিক অধিকারসমূহকে নিশ্চিতকরণ। এ নিশ্চতকরণের জন্যই প্রয়োজন সামাজিক ন্যায়বিচার (social justic), সামাজিক সততা (social fairness), সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। অন্যভাবে বলা যায় মানবতাবাদী দর্শন বলতে ঐ মতবাদকে বুঝায় যে মতবাদের বিষয়বস্তু হলো মানুষ-মানব সম্পর্কীয়। মানবতাবাদের ইতিহাস বির্বতনের ধারায় পরিবর্তন হলেও এর মূল শ্লোগানের মধ্যে অভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কেননা মানবতাবাদের সার কথা হলো মানুষের কল্যাণ এবং মানুষকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। এ প্রসঙ্গে টনি ডেভিস বলেন-

> The essence of humanism consisted in a new and vital perception of the dignity of a man as a rational being apart from theological determinations, and in the further perception that classic literature along displayed human nature in the plenitude of intellectual and moral freedom. It was partly a reaction against ecclesiastical depotism, partly an attempt to find the point of unity for all that had been thought and done by man, within the mind restored to consciousness of its own sovereign faculty. (T. Davies, 1997: 22)

অর্থাৎ মানবতাবাদের মূল সুর নিহিত ধর্মীয় একাগ্রতা ব্যতিরেকে একটি নিয়মবদ্ধ সৃষ্টিরূপে, একটি নতুন ও ব্যাপক ধারণার মধ্যে এবং ধ্রুপদী সাহিত্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক স্বাধীনতার স্বরূপে। এ

মতবাদ গির্জা বা যাজকদের প্রতি আংশিক বিরুদ্ধবাদ এবং এটি ঐ সকল বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় অন্বেষণের আংশিক প্রয়াস যা কিনা নিজস্ব সার্বভৌমত্বের সচেতন চিন্তারূপে মানব কর্তৃক রচিত হয়েছিল। মানুষের সকল চিন্তা ও কর্মের মধ্যে যখন মানুষের কল্যাণের অংশ স্থান করে নিতে পারে, তখনই মানুষ হয়ে ওঠে সত্যিকার মানবতাবাদী। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক লতিফা বেগম তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, "মানবতাবাদ বলতে মানুষে মানুষে প্রেম, মৈত্রী ও ভালোবাসার সম্বন্ধকে বুঝা যায়। মানুষ যাতে কোন অবস্থায় অন্য মানুষকে পীড়ন না করে, অথবা তাকে শোষণ না করে এরূপ মনোভাবের সৃষ্টি বুঝায়।" (লতিফা বেগম, ১৯৮২ : ৫৩)

মানব মর্যাদা, মানব স্বাধীনতা ও মানবাধিকার শব্দগুলো একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেমন স্বাধীনতার ধারণাটা অত্যাবশ্যক, তেমনই মানব স্বাধীনতার স্বীকৃতির উপরই দাঁড়িয়ে আছে মানবতার দার্শনিক সৌধটি। সোফিস্টরা প্রথম মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা ও মর্যাদার বিষয়টি ঘোষণা করেন।

মানবতাবাদকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা প্রনয়ণ করার প্রবণতা ১৮ শতকে বস্তুবাদী চিন্তায় শুরু হয়। তবে প্রাচ্যে মানবতাবাদের উপলব্ধি প্রোথিত হয় হাজার বছর আগে। এর পর সক্রেটিস (Socrates), অগাস্টে কোঁতে (auguste comte), সোরেন কিয়ার্কেগার্ড (soren kierkegaard), কার্ল ইয়েসপার্স (Karl Jaspers) প্রমুখ মানবতাবাদী দার্শনিকগণ মানুষকে মুক্ত করতে, মানুষের স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে দিতে, মানব মর্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হন। ফলে এসব দার্শনিকদের মানবতাবাদী ধারণা পরম জাগতিকতায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাঁরা মানুষকে যথার্থ পথ দেখিয়ে মুক্ত করতে পারেননি। ব্যর্থ হয়েছেন মানুষের পরম আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করতে।

মানবতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধানের জন্যই পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি উন্নত দার্শনিক ধারা আবর্তিত ও বিকশিত হতে দেখা যায়। মানুষের সার্বিক কল্যাণের সহায়ক মানবাতবাদী দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মানবতাবাদীগণসহ সাহিত্যিক, দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদরা নিরলস পরিশ্রম করেছেন ও মানবতাবোধের নৈতিক অবক্ষয় রোধকল্পে কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। অগাস্ট কোঁতে, উইলিয়াম জেমস, হার্বার্ট স্পেন্সার, মাদার তেরেসা, ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল, কার্ল মার্কস, জ্যাঁ-পল সার্ত্র, বার্ট্রান্ড রাসেল, হাজী মুহাম্মদ মহসিন, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মানবতাবাদীগণ মানবমুক্তির উপায় অনুসন্ধানকেই দর্শন চর্চার ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এভাবেই যুগের প্রয়োজনে মানুষের অন্তর্নিহিত স্বরূপ ও সত্তাকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দার্শনিকরা দর্শন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হন। এ চিন্তার মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে তার আপন মহিমা সম্পর্কে সচেতন করা, যাতে সে সমাজে নিজেকে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে।

পাশ্চাত্য দর্শনে মানবতাবাদ

পাশ্চাত্য দর্শনে মানবতাবাদের একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। যার মূল বক্তব্য সুদূর অতীত এবং মানব সভ্যতা শুরু হবার প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল। পাশ্চাত্য মানবতাবাদী দর্শন অনেকটা উপেক্ষিত ছিল। পাশ্চাত্য মানবতাবাদী দর্শন যেটুকু আলোচিত হয়েছে তা 'নৈতিকতা' সর্ম্পকীয় আলোচনার আবরণে। যদিও গ্রিক নৈতিকতা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল সক্রেটিসের সময় থেকে। তবে পিথাগোরাস, ডিমোক্রিটাস ও হিরাক্লিটাসের দার্শনিক তত্ত্ববিদ্যায় কিছুটা নৈতিক ভাবাদর্শের ইঙ্গিত রয়েছে।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রথম মানবতাবাদী দার্শনিক হচ্ছেন গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরাস, যিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মানবতাবাদ সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত উক্তি হলো-"Man is

the measure of all things; of what is, that it is; of what is not, that it is not.Ó (W. T. Stace, 1972 :112)

অর্থাৎ মানুষ হলো সব কিছুর পরিমাপক; যা আছে তাই সত্য, যা নেই তা সত্য নয়। এ উক্তির জন্য দর্শনের ইতিহাসে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। সক্রেটিস মানব কল্যাণে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। এরিস্টোটলের মধ্যেও মানবতাবাদী চিন্তা পরিলক্ষিত হয়। এরিস্টোটলের পর হতে মানবতাবাদ প্রকৃতিবাদী ও জড়বাদী দর্শনের ছদ্মবেশে পাশ্চাত্য দর্শনে বিকাশ লাভ করে। আধুনিক যুগে স্পিনোজার দার্শনিক চিন্তায় প্রকৃতিবাদী মানবতাবাদ পরিস্ফুটিত হয়। তবে মানবতাবাদী ধারণা চার্লস ডারউইন, জন র‍্যানডাল, উইলিয়াম জেমস, এফ,সি,এস শিলার, জন ডিউঈ প্রমুখের চিন্তা ধারায়ও বিদ্যমান ছিল। জড়বাদী মানবতাবাদের উদ্ভব ঘটে প্রাচীন গ্রিসে। ডিমোক্রিটাস, লিউসিপাস ছিলেন জড়বাদের সমর্থক। আধুনিককালে বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাভাবনায় জড়বাদী মানবতাবাদের প্রকাশ পেয়েছে। টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) জড়বাদকে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। তিনি সকল প্রকার অতি প্রাকৃতিকবাদের বিরোধী ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ল্যা ম্যেটরিক, ড্রেভিটাস ও অন্যান্য দার্শনিকের চিন্তায় জড়বাদী মানবতাবাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানীতে আরনষ্ট হ্যেকল (১৮৫৩৪-১৯১০), ফুয়েরবাখ (১৮০৪-১৮৭৭), কার্লমার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (১৮১৪-১৮৯৫) প্রমুখের চিন্তায় জড়বাদী মানবতাবাদের বিকাশ ঘটে। এভাবে সভ্যতার শুরু থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাধারায় মানবতাবাদী ধারণা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়।

ঊনিশ শতকে ফ্রান্সে অগাস্ট কোঁতের হাতে এক ধরনের মানবতাবাদ প্রকাশ পায়, এটাকে এক ধরনের জটিল ধর্মীয় মানবতাবাদ বলা যেতে পারে। এ ধর্মীয় মানবতাবাদ ঐ সময়ে পাশ্চাত্যে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশ শতকে ফ্রান্সে অস্তিত্ববাদের আবরণে মানবতাবাদী দর্শনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর প্রধান প্রবক্তা হলেন জ্যাঁ-পল-সার্ত্র। তবে অস্তিত্ববাদ মানবতাবাদী দর্শন হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে সোরেন কিয়ের্কেগার্ডের লেখায়। ঊনিশ শতকে ব্রিটিশ দার্শনিক জেরেমী বেন্থাম, জেমস মিল ও জন স্টুয়ার্ট মিল প্রচারিত উপযোগবাদী চিন্তায় মানবতাবাদের বিকাশ ঘটে। আর বিশ শতকে মানবতাবাদের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেল। পাশ্চাত্যে মানবতাবাদী দর্শন বিকাশে বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনের অবদান কম নয়। ১৯৩০ এর দশকে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে 'একেশ্বরবাদী আন্দোলন' ঘটে তা ছিল মূলত একটি মানবতাবদী আন্দোলন। এ আন্দোলনটা ছিলো মানবিক মূল্যবোধের স্বার্থে অতি রক্ষণশীল খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে একটি ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন। এ আন্দোলনের ফলে পরবর্তী সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় ধর্মীয় মানবতাবাদ শুরু হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় সংঘটিত সার্বজনীন যুক্তিবাদ আন্দোলন ছিল একটা ধর্মীয় মানবতাবাদী আন্দোলন।

প্রাচ্য দর্শনে মানবতাবাদ

গৌতম বুদ্ধের অনুধ্যানী চিন্তার মাধ্যমে প্রাচ্যে মানবতাবাদী দর্শন প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করে। গৌতম বুদ্ধ তাঁর পরিবেশ এবং যুগসন্ধিক্ষণের সৃষ্ট অনন্য মানবতাবাদী। গৌতম বুদ্ধ প্রত্যেককেই নিজের মুক্তির জন্য নিজেকে চেষ্টা করতে বলেছেন। তৎকালীণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গৌতম বুদ্ধের মানবতাবাদী দর্শন একটি রক্তপাতহীন বিপ্লবের সূচনা করে এবং এ বিপ্লবের মূল বাণী সমগ্র বিশ্বকে আলোড়িত করে। গৌতম বুদ্ধের মানবতাবাদী দর্শনের ভিত্তি হলো মানব ঐক্য তথা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। এ প্রসঙ্গে জি.সি. দেব বলেন,

> As the pioneer of a great historic religion, Buddha has a great spiritual message, no doubt. But behind, there is a wide human appeal, a defense of human values on critical, rational approach. Judged from these

> perspective, in Buddha, the humanist we might find very reasonably, I believe, the elan of the unity of man, of a world united in an effort, however difficult it may be, to further human values on a world scale. (G. C. Dev, 1969: p.7)

অর্থাৎ একটি ঐতিহাসিক ধর্মের পথিকৃত হিসাবে নিঃসন্দেহে বুদ্ধের একটি আত্মিক বাণী রয়েছে। তবে এর পশ্চাতে রয়েছে একটি জটিল নিয়মতান্ত্রিক আচরণের উপর বিস্তৃত মানবীয় আবেদন ও মানবিক মূল্যবোধের পক্ষে এক মতবাদ। এ প্রেক্ষাপট থেকে বিচার করে খুব সঙ্গত কারণেই আমরা বিশ্বাস করি যে, বুদ্ধকে আমরা পেতে পারি প্রচেষ্টালব্ধ একীভূত পৃথিবীর মানুষের একতার একজন প্রাণবন্ত মানবতাবাদীরূপে।

গৌতম বুদ্ধের দর্শন প্রেম-ধর্মের দর্শন। তিনি ধর্মকে বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান। বুদ্ধ কোনো নির্বিচারবাদী ধারণা, অন্ধবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করেননি। তিনি এ বাস্তব জীবনকে একটি সুখি, সুন্দর, দুঃখমুক্ত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি মনে করেন এ জীবন স্বর্গীয় আনন্দ দ্বারা সিক্ত হবে না, বরং মানুষের কল্যাণ কামনায় পরিপূর্ণ হবে। তিনি নির্বাণ লাভের পর আত্ম-মানবতার সেবায় নিয়োজিত থেকেছেন এবং মানব কল্যাণে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন। অর্থাৎ মানব কল্যাণের প্রার্থনাই বৌদ্ধ র্দশনের মূল তাৎপর্য।

মহাত্মা গান্ধীর মধ্যেও মানবতাবাদী ধারণার বিকাশ লক্ষ্য করা যায় তবে তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানবতাবাদী ধারণার ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু গান্ধী ধর্মকে মৌলবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেননি। তাঁর মতে, হিন্দু ধর্ম সততা ও ন্যায়বোধের কথাই বলে। ধর্ম ব্যক্তিকে সততা, ন্যায়, ও কল্যাণের পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করে। তঁর মানবতাবাদী ধারণার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ হলো গণতন্ত্রের ধারণা। তিনি বলেন "অহিংসা, সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সরকার ছাড়া অন্য কোন শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হতে পারে না।" (দাশ, ১৯৯৭:১৪২)

তিনি তাঁর চিন্তা-ধারায় ন্যায়, আদর্শ ও নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদগণ স্বাধীনতাকে যেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলে ভাবতেন, সেখানে গান্ধী মনে করতেন স্বাধীনতা সব সময় সমাজকেন্দ্রিক। সাম্য কথাটি স্বাধীনতার সাথে জড়িত। আর সাম্য মানবতার সাথেও জড়িত। গান্ধী বলেন,

> অর্থনৈতিক,সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জাতপাতের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তি সাম্যের অধিকারী। কিন্তু সাম্য কখনো তাঁর কাছে চরম একরূপতা বলে প্রতিভাত হয়নি। শারীরিক ক্ষমতা, বুদ্ধি বা দক্ষতার বিচারে মানুষে মানুষে বৈষম্য থাকতেই পারে, কিন্তু তা নিম্ন মেধা বা দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তির সার্বিক বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না। সকলে সমান যোগ্যতা ও ক্ষমতার অধিকারী হবে গান্ধী তা মনে করেননি। কিন্তু প্রতিটি মানুষের অন্তর্নিহিত গুনাবলী বিকাশের সুযোগ থাকবেই। যে কোন ব্যক্তি সমান সুযোগ দাবী করতে পারে এবং সে অধিকার তার আছে। (দাশ, ১৯৯৭:১৪৪)

তাঁর এ মতবাদে আমরা মানবতাবাদের স্পষ্ট ধারণা পাই। তাঁর মানবতাবাদী ধারণায় কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সমন্বয় লক্ষ করা যায়। যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। তিনি বলেন যে, কর্মের মধ্যে মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে। আর জ্ঞানের মাধ্যমে সে নিজেকে বিকশিত, প্রকাশিত এবং আলোকিত করতে পারে। অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন এমন একটি সমাজ যার ভিত্তি হবে স্বাধীনতা, সুবিচার, সাম্য, প্রেম-প্রীতি, শান্তি এবং অহিংসা। এ রকম সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ সমান অধিকার ভোগ করতে পারে। তাতে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। তাঁর অহিংস রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় মানবাতবাদী ধারণার স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও মানবতাবাদী চিন্তাধারা লক্ষ করা যায়। তবে তাঁর মানবতাবাদী ধারণা ছিল আধ্যাত্মিক ধারার। রবীন্দ্র দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ। রবীন্দ্রনাথের মতে সত্য হচ্ছে মানবিক সত্য, ধর্ম হচ্ছে মানুষের ধর্ম। মানুষকে বাদ দিয়ে সত্য, ধর্ম ও বিশ্বজগত কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল মনুষ্যত্বের সাধনা। তাঁর সাধনা দেশকাল বা বিশেষ ধর্মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সব মানুষের মধ্যে রয়েছে একটা বিশিষ্টতা। এ বিশিষ্টতা বা সার সত্তা দিয়েই দেশ কাল অতিক্রম করে গড়ে উঠে এক মানব সত্তা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এ মানব সত্তাই হচ্ছে "সর্বজনীন সর্বকালীন মানব।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০৪:৬৫৯) মানুষ জীব সত্তার সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে উপলব্ধি করে মানব সত্তা। এ সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতার উপরে উঠতে না পারলে মানব সত্তার যথার্থ বিকাশ ঘটবে না। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন মানুষ পূর্ণ সত্য নয়, তার বাইরে এই সমগ্র বিশ্বকে নিয়েই সে পূর্ণ সত্য। রবীন্দ্রনাথের মতে, অসীম নিরন্তর প্রকাশিত হয়ে চলেছে সীমার মধ্যে দিয়ে। অসীমের প্রেরণা উপস্থিত প্রতিটি মানুষের অন্তরে। এ প্রেরণা অবলম্বনে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং সেই কর্ম দ্বারা ব্যক্তিগত, সামজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে এবং পরিণামে সমগ্র পৃথিবীকে ন্যায়, সত্য ও কল্যাণের পথে পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রতিটি মানুষের, তবে একক মনুষ্যত্বের মধ্যে মুক্তি নেই, মুক্তি নিহিত সমগ্র মানব সংসারের পূর্ণ প্রকাশে। একটি প্রদীপ যেমন রাতের অন্ধকার ঘোঁচাতে পারে না, তেমনি একক ব্যক্তির চেষ্টায়ও সমাজের ব্যাপক কল্যাণ সাধিত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন সব মানুষের সমবেত প্রচেষ্টা। এটাই মানুষের পূর্ণতার সাধনা। এ সাধনায় মানুষকে সহায়তা করার জন্যই যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন বহু মহৎ প্রাণ মহাপুরুষ। (আমিনুল ইসলাম, ২০০২: ১৬৬)

রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষের মধ্যে দুটো দিক রয়েছে। এক, সে 'আমি'-তেই সীমাবদ্ধ থাকে, আর এক 'আমি' হলো সর্বত্র ব্যাপ্ত। আমরা যখন ছোট আমিকে আঁকড়ে ধরি তখনই আমরা মানব ধর্ম থেকে বিচ্যুত হই। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এটাই হচ্ছে অহং আপনাতে আবদ্ধ। এই ছোট 'আমি' অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্ধ হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০৪:৪২৫) এখানে রবীন্দ্রনাথ যে 'আমি'র কথা বলেছেন তা সর্বজনীন মানুষ। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূলে ছিল সমগ্রবাদী মানবতত্ত্ব। তিনি মানুষকে দেখেছেন সমগ্র দৃষ্টিকোণ থেকে। রবীন্দ্রনাথের মতে "এই মানুষ জৈবসত্তা এবং আত্মিক সত্তা মিলিয়ে এক পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি" (রফিকউল্লাহ খান, ১৯৯৩:২) রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর চেতনা সমগ্র মানুষের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমার দেবতা মানুষের বাইরে নেই। নির্বিকার নিরঞ্জনের অবমাননা হচ্ছে বলে, আমি ঠাকুর ঘর থেকে দূরে থাকি একথা সত্য নয়– মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে বলে আমার নালিশ।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩১৭ :৪)

এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধের মূলে ছিল মানব বিশ্বাস ও মানুষের কল্যাণ। তাঁর মানবতাবাদ কোনো প্রকার আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় সংকীর্ণতা দ্বারা কলুষিত হয়নি। কারণ মানুষের মঙ্গলেই ছিল তার জীবন দর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয়। মানব দর্শনই ছিল রবীন্দ্রনাথের আমৃত্যু আরাধ্য বিষয়।

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন এজন অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী কবি। তাঁর কবি ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য মানব কল্যাণ ও স্বদেশপ্রেম। মানুষের সার্বিক কল্যাণই ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাদর্শন ও আত্মদর্শন। কারণ তিনি মানুষকে, মানুষের অস্তিত্বকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাসে সমাজের সংকীর্ণতা, ধর্মীয় সংকীর্ণতা, মানুষে মানুষে বিভেদ, সাম্প্রদায়িকতাকে দূর করার চেষ্টা করেছেন। সমগ্র পৃথিবীকে তিনি এক দেশ হিসেবে ভাবতেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় রাষ্ট্র ও সমাজের মানুষের মধ্যে যে শোষণ, বঞ্চনা ও অসাম্য রয়েছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতায় বলেন,

মহা বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ রণ-ভূমে রনিবে না-
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত

তিনি কখনও মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করেননি। তিনি নারী পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মানব ধর্মকেই সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। তিনি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতায় সাম্যবাদকে সব ধর্মের মহামিলনরূপে ব্যাখ্যা করেন। এখানে তিনি বলেন,

গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রিষ্টান। (কাজী নজরুল ইসলাম, ১৯৯৬ :২)

তিনি মনে করেন মানুষ যে ধর্মেই বিশ্বাসী হোক না কেন তাদের মূল পরিচয় তারা মানুষ। তিনি মনে করতেন ধর্মের নামে মানুষের প্রতি মানুষের দুর্ব্যবহার শোষণ, অন্যায়, অবিচার যুক্তিসঙ্গত নয়। তিনি তাঁর জীবনদর্শনে মানুষের জয়গান করেছেন যা মানবতাবাদের মূলমন্ত্র।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন ইহজাগতিক ও বাস্তববাদী দার্শনিক। বিদ্যাসাগরের যাবতীয় কাজ কর্মের উৎস ও প্রেরণা ছিল মানুষ। মানুষ ও মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। এ কারণে তিনি সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন কুপ্রথার বিলোপ সাধন করার চেষ্টা করেন। এর মাধ্যমে তিনি মানুষের মানবিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। তিনি পারলৌকিক চিন্তায় সময় ব্যয় না করে, মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগকে শ্রেয় মনে করতেন।

> তিনি সর্বতোভাবে একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ যথার্থ আধুনিক মানুষ। তাঁর আধুনিকতা স্বাভাবিক কারণেই ঔদার্যে মহান– 'মানুষ শ্রেষ্ঠ' এই বোধের চেতনায় সুপ্রতিষ্ঠিত। ইউরোপীয় মানবিকতাবোধের আদর্শ এদেশে রামমোহন, ডিরোজিও, ইয়ং-বেঙ্গল গোষ্ঠী, পজিটিভিজম- প্রচারক রামকমল ও কৃষ্ণকমল প্রমুখের চিন্তা ও রচনার মাধ্যমে সঞ্চারিত হলেও পুরোপুরি নিরীশ্বর কোন মতাদর্শই এদেশের শিক্ষিত সমাজে দানা বাঁধতে পারেনি। বিদ্যাসাগরের মানবিকতা র আদর্শ ঈশ্বর জিজ্ঞাসার সঙ্গে লিপ্ত না হলেও কেবল মাত্র ইউরোপীয় চিন্তা ধারায় প্রভাবিতও নয়। (বিশ্বনাথ দে, ১৯৯২: ৮৪)

জাগতিক মঙ্গল ও কল্যাণের ভাবনা তাঁর মানবতাবাদী দর্শনে প্রবল। এ প্রসঙ্গে অরবিন্দ পোদ্দার বলেন, "শিক্ষাসংস্কার, সাহিত্য, সমাজ সংস্কার, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি যাবতীয় কর্মে বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য মানুষ। জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে মানুষের মানবতার অম্লান স্বীকৃতি তাঁর বোধ ও উপলব্ধির মূল কথা।" (অরবিন্দ পোদ্দার, ১৯৭৮ : ৩৫০)

বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর জীবন ধারা ছিল হিন্দু ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ তিনি জগতকে দেখার চেষ্টা করছেন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে।

বাংলাদেশের সমকালীন দার্শনিকদের মধ্যে যার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব। মানবতার ক্ষেত্রে তিনি জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মিলনের কথা বলেন। তিনি বলেন,

> মানবাতবাদ আমরা চাই এবং আমাদের কল্যাণের জন্যই আমরা আরো বেশী করে চাই, কিন্তু আমরা জাগতিক মানবতাবাদ চাই না। সাধারণ মানুষের জীবনের উন্নতির জন্য জাগতিক মানবতাবাদ নিঃসন্দেহে প্রয়োজন, কিন্তু তা একদেশদর্শীতায় দুষ্ট এবং আমরা যদি এই একাদেশী ও চরমপন্থা মেনে নেই, তাহলে আমরা কুকুরের বাঁকা লেজ আর কখনো সোজা করতে পারবো না। (G. C. Dev, 1963: 29)

আমরা জাগতিক মানবতাবাদ গ্রহণ করলে চরম উৎকর্ষ সাধিত হবে না। কারণ এ পারমাণবিক যুগে জাগতিক মানবতাবাদ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। তিনি মানবতাবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ড. দেবের মধ্যে, মানবতাবাদ শুধু মানুষের মহিমা প্রচার করার মতবাদ নয়, বরং মানবতাবাদ মানব কল্যাণকে সেবার ব্রত হিসেবে গ্রহণ করার প্রেরণা সংক্রান্ত মতবাদ। এছাড়াও আচার্য প্রবোধ চন্দ্র সেন, কবি নাজীব ফেরদৌস, মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখের চিন্তাধারায় মানবতাবাদী দর্শনের প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও মানবতাবাদ

ধর্মীয় বিশ্বাস, কুসংস্কার ও গোঁড়ামি দ্বারা পৃথিবীর মানুষ যত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যুদ্ধ, বিশৃঙ্খলা ও হানাহানি থেকে তার চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কারণ ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামির শিকার হয়ে মানুষ যে পরিমাণ উগ্র ও সন্ত্রাসী কর্মে লিপ্ত হয় তার সঠিক পরিসংখ্যান দেয়া কঠিন বিষয়। ভারতবর্ষের ধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে লক্ষ করলে দেখা যায়, একদিকে যেমন সাধু মহাপুরুষদের ধর্মনীতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছে, তেমনি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ঘৃণা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ধর্মীয় বৈষম্যকে প্রকট করে তুলেছে। ভারতবর্ষে সনাতন হিন্দুধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। একই ভারতীয় সমাজে এরূপ বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্ম সম্প্রদায় থাকায় প্রতিপত্তি লাভকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক সংঘাত, দ্বন্দ্ব ও বিরোধ দেখা দিয়েছে। হিন্দু বৌদ্ধযুগে হিন্দুদের হাতে বৌদ্ধরা বিভিন্নভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিহার রঞ্জন রায় বলেন,

> ... বাঙলার হিন্দুরাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষতো সর্বজনবিদিত। তাঁর বৌদ্ধ বিরোধিতা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। তিনি গয়ার বোধিদ্রুম কেটে পোড়ায়ে ফেলেন, বুদ্ধ প্রতিমাকে অন্য মন্দিরে স্থানান্তরিত করে সেই স্থানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কুসীনারার এক বিহার হতে ভিক্ষুদিগকে তাড়িয়ে দিয়ে বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করেন। (নিহার রঞ্জন রায়, ১৩৫৬ : ৬১০)

পরবর্তীকালে বৌদ্ধগণও সুযোগ পেয়ে হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেছে। তারা হিন্দুদের নির্যাতন দেখে উল্লসিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বখতিয়ার খিলজির হাতে অনেক বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এভাবে ধর্মীয় দোহাই দিয়ে হিন্দুদের উপর বৌদ্ধদের, বৌদ্ধদের উপর হিন্দুদের, হিন্দুদের উপর মুসলমানদের বহু নির্যাতনের কাহিনী পরিলক্ষিত হয়। এভাবে ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম ও খ্রিষ্টান ধর্মের প্রচারকগণ যখন শাশ্বত মানবতাবাদী মানবধর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে কেবল অন্ধ গোঁড়ামী প্রচার করেছিল তখন বাঙালি মানস সান্তনার পথ খুঁজে পেয়েছে শ্রী রামকৃষ্ণের উদার ও মহান বাণীতে। কেননা, শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব কোনো দল বা মত ছিল না। এ প্রসঙ্গে প্রণবেশ চক্রবর্তী মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন,

> তিনি ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান বা হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের মতো কারোর বিরুদ্ধে লড়াই করেননি, তর্কযুদ্ধে নামেননি, কাউকে ছোট বানাতে চেষ্টাও করেননি, শুধু সবাইকে ডেকে বলেছেন, মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্যই হলো ঈশ্বরলাভ। অর্থাৎ এতো দিন যাঁরা এলেন, ধর্ম প্রচার করলেন, তাদের সকলেরই কিছু-না কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল, ছিল সীমাবদ্ধতা, ছিল অপূর্ণতা যা সম্পূর্ণ করতে

ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, যিনি বলেছেন, 'যতমত তত পথ।' (প্রণবেশ চক্রবর্তী, ১৯৮৫:২৩)

প্রতিটি বিশ্বাসকে তিনি পরীক্ষিত সত্যের ভিত্তির পর দাঁড় করিয়ে পরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার চেষ্টা করতেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে না পেরে ধর্মীয় আবরণে বিভিন্ন ধর্মের অনেক মানুষই মানবতাকে, মানবধর্মকে পদদলিত করেছে। কিন্তু প্রতিটি ধর্মের মূলে রয়েছে মানবতার মূলমন্ত্র অর্থাৎ মানুষের কল্যাণের কথা। কিন্তু মানুষের ধর্মের প্রতি প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করেছে।

মানুষ সবকিছুর উর্ধ্বে যেদিন মানুষ ও মানুষের কল্যাণকে স্থান দিতে পারবে, সেদিনই প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যিকারের ধর্ম, সত্যিকার সম্প্রদায়, সত্যিকার সমাজ ও সত্যিকার রাষ্ট্র। অর্থাৎ পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে নিজ নিজ সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করে অপরের কল্যাণে কাজ করতে হবে। প্রেম, মৈত্রী ও কল্যাণ এগুলো দিয়েই পৃথিবীকে জয় করা সম্ভব।

মানবতাবাদ ও সাম্যনীতি

সাধারণ অর্থে সাম্যনীতি বলতে বুঝায় সকল মানুষ সমান। ফলে প্রত্যেক মানুষ সমান সুযোগ সুবিধা, সমান অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে। যদিও প্রাকৃতিক নিয়মেই এটা অসম্ভব। কারণ পৃথিবীতে মানুষে মানুষে শারীরিক ও মানসিক গঠন এবং গুণগত যোগ্যতার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কাজেই রুচি ও সামর্থ্য বিষয়ে যতদিন মানুষে মানুষে ভেদ থাকবে ততদিন মানব সমাজে বৈষম্য বিদ্যমান থাকবে। প্রাকৃতির এ অমোঘ নিয়মের কাছে মানুষ অসহায় তবে একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রাকৃতিক বৈষম্য ছাড়াও কতগুলো কৃত্রিম বৈষম্য সৃষ্টি করে মানুষ বিধাতার উপরে খবরদারি করতে চায়, প্রতিষ্ঠিত করতে চায় প্রকৃতির উপর তার কর্তৃত্ব। কখনও গায়ের জোরে, কখনও বুদ্ধির জোরে আবার কখনও টাকার জোরে, মানুষ মানুষকে তফাৎ করে। যেমন শাস্ত্রবিধির দোহাই দিয়ে ব্রাহ্মণ নামক হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ সম্প্রদায় হিন্দুসমাজে প্রাধান্য লাভ করে, নিজেরদের অধিকার ভোগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। আবার সমাজের একদল লোক গায়ের জোরে অন্যকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এ বিশেষ অধিকার বৈষম্যের নির্দশন। কিন্তু সাম্যবাদ এ ধরনের বিশেষ কোনো অধিকার স্বীকার করে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে এটাই সাম্যনীতির মূলকথা। অর্থাৎ সাম্যনীতি বলে যে, সকলকেই মানুষ হয়ে উঠার সমান সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। সকল মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিই সাম্যবাদের মূলকথা। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে যেমন প্রয়োজন মানুষের অধিকারের সাম্য তেমন প্রয়োজন মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে মানুষকে মানুষের মতো জীবন ধারণের উপযোগী করে গড়ে তোলা। সাম্যচিন্তা মানুষের সুস্থ ও উন্নত মনের পরিচয় বহন করে। প্রতিদিনের জীবন যাত্রায় মানুষ লোভ-লালসা, স্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠতে পারে না। কিন্তু সাম্যনীতির কথা মানুষের কাছে স্পষ্ট থাকলে মানুষ আপন স্বার্থপরতা কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠতে পারে।

বিশ্বপ্রকৃতি আপন বিচিত্র লীলায় নিরন্তন সাম্যবাদ-মানবতাবাদ প্রচার করছে। কারণ প্রকৃতির সকল সুবিধা সকলে ভোগ করতে পারে, আবার অসুবিধাও সকলের ভোগ করতে হয়। কারণ প্রকৃতির সৃষ্টি যেমন সত্য, ধ্বংসও তেমন সত্য। জন্ম যেমন শুভ্র ও নির্মল, মৃত্যু তেমনি উদার ও পবিত্র। জন্মে যেমন সাম্য, মৃত্যুতেও তেমন সাম্য। জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানের জীবনে মানুষই তৈরি করে বৈষম্য। কিন্তু আমরা যদি সাম্যনীতি অনুসরণ করি তবে মানবতাবাদী আদর্শে সহজেই অগ্রসর হতে পারব। প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে তার বিবেক। যে বিবেক বলে হিংসা নয়, শোষণ নয়, দ্বেষ নয়, পীড়ন নয়-প্রেমের পথই একমাত্র পথ। প্রেম ও সাম্যের গানের গভীর মর্মবাণী যেদিন বিশ্ব মানবের কানে গিয়ে পৌঁছবে, সেদিন বিশ্বমানবতা-বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা আর অবাস্তব বলে মনে হবে না।

ধর্মের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক সাম্যবোধ-মানবতাবোধ ভারতবর্ষের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। এদেশ চিরদিনই এ সাম্য-মানব ঐক্যের সাধনাই করেছে। এজন্য দেখা যায় ইসলাম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি কোন ধর্মকেই ভারতীয় জনসমাজ প্রত্যাখান করেনি। সকল ধর্মেরই মূলে যে শাশ্বত মানবধর্ম রয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে চলেছে সাম্য, মানবতা, ঐক্য ও সামঞ্জস্য স্থাপনের একটি সুস্থির প্রয়াস।

সুতরাং দেখা যায় যে, মানবতাবাদ হলো এমন একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, যাকে প্রত্যক্ষ জীবনদর্শন বলা যায়। যা মানুষের মযার্দা ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি সবিশেষ আস্থাশীল। যা মানুষের চেয়ে শ্রেয়তর বাহ্যিক কোনো ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাস করতে নারাজ। তবে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে মানবতাবাদী ধারণার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মানবতাবাদী ধারণা যে দৃষ্টিকোন থেকে বিকাশ লাভ করুক না কেন সেখানে মানবতার মূল কথার কোন ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় না। কেননা মানবতাবাদী ধারণার ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণের বাইরে গিয়ে কোন কিছু চিন্তা করা হয় না। কারণ এ ধারণার কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে মানুষ, মানুষের কল্যাণ ও মানুষের মুক্তি। এ জন্য দরকার মানব প্রেম। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, মানবতাবাদ হলো মূলত মানব প্রেম। সুতরাং বলা যায় যে প্রত্যক্ষ জীবনদর্শন হিসেবে বর্তমানে মানবতাবাদ এক অনন্য মতবাদ। যে মতবাদ সঠিকভাবে চর্চা করতে পারলে মানুষসহ পৃথিবী সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে বলে মনে করা যেতে পারে।

টীকা

১. প্রগতি এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো progress। এটি ল্যাটিন Pro-gredio শব্দ থেকে এসেছে। মূল এ ল্যাটিন শব্দটির অর্থ হলো 'সামনে চলা' (to step forword)। প্রগতি বা অগ্রগতির মৌলিক অর্থ হচ্ছে আকাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সামনে চলা বা অগ্রসর হওয়া। তবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রগতির একটি নৈতিক বা নীতিগত অর্থ রয়েছে এবং মানবজাতি যে চূড়ান্ত নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের দিকে ছুটছে সেটার অগ্রগতিকেও বুঝানো হয়। প্রগতিবাদ বা অগ্রগতিবাদ হলো অগ্রসরমান পরিপূর্ণতা (development of advancing fulfilment) পরিপূর্ণতা অর্থ হলো ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা। কেবল মাত্র সংগতিপূর্ণ উদ্দেশ্যের মাধ্যমে যে পরিপূর্ণতা অর্জন করা হয় তাকে বলা হয় প্রগতিবাদ।

২. মানবতাবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Humanism' এটি ল্যাটিন শব্দ 'Literae Humaniores' থেকে এসেছে। মানবতাবাদ শব্দটি দ্বারা মানুষের প্রতি দয়াকে বোঝানো হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, মানবতাবাদ হলো মানুষের সেবার দর্শন। বাংলা ভাষার অভিধান ও বিশ্বকোষগুলো 'মানব' শব্দটির উৎপত্তি 'মনুষ্য' অর্থাৎ মনুর অপত্য তথা 'মনু'র স্নেহভাজন বা পুত্রবৎ বলে নির্দেশ করে। (নগেন্দ্রনাথ বসু :১৩০৯), ***বিশ্বকোষ***, খণ্ড ১৪, কলকাতা

উল্লেখপঞ্জি

কাজী নজরুল ইসলাম [সম্পা.] (২০১৮)। *নজরুলসমগ্র*, ১ম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম [সম্পা.] ইনস্টিটিউট, ঢাকা

শরীফ হারুন [সম্পাদিত] (১৯৯৯)। *বাংলাদেশ দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, ৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি

সুকুমার সেন (১৯৬৬)। [সম্পাদিত] *চর্যাগীতি পদাবলি*, (২য় সংস্কারণ), কলিকাতা

আবুল কাশেম ফজলুল হক (১৯৮৪)। *'মার্কসবাদ ও নৈতিকতা'*, দর্শন ও প্রগতি, ১ম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দেব সেন্টার, ঢাকা

লতিফা বেগম (১৯৮২)। *বিশ্ব সংস্কৃতিতে মানবতাবাদ: ধর্ম ও দর্শনে*, দর্শন, ৭ম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা

পি.জি. দাশ (১৯৯৭)। *পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা ও ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন* , দ্বিতীয় খণ্ড। নিউ সেন্টাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২০০৪)। *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড। ঐতিহ্য, ঢাকা

ড. আমিনুল ইসলাম(২০০২)। *বাঙালীর দর্শন: প্রাচীন কাল থেকে সমকাল*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

রফিকুউল্লাহ খান (১৯৯৩)। *রবীন্দ্র-বিষয়ক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩১৭) । *চিঠিপত্র-৯*, পত্র সংখ্যা-২। বিশ্বভারতী, কলকাতা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৯৯৬)। *সাম্যবাদী*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা

বিশ্বনাথ দে [সম্পা.] (১৯৯২)। *বিদ্যাসাগর স্মৃতি*, সাহিত্যম্, কলকাতা

অরবিন্দ পোদ্দার (১৯৭৮)। *বাংলার নবজাগরণ ও বিদ্যাসাগর*, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, সেপ্টেম্বর সংখ্যা, কলকাতা

নিহার রঞ্জন রায় (১৩৫৬) । *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদি পর্ব। কলকাতা

প্রণবেশ চক্রবর্তী (১৯৮৫)। *শ্রীরামকৃষ্ণের সমাজ দর্শন*, কলকাতা

T. Davies, (1997) *Humanis,* Routledge, London and New York

W. T. Stace (1972) *A Critical History Of Greek Philosophy*, St. Martins Press, Macmillan

G. C. Dev (1969), *Buddha the Humanist*, Paramount Publishers, Dacca, Karachi, Lahore

G. C. Dev (1963), *Aspirations of the Common Ma*n, Dhaka University, Dhaka